

ਬਰੋਯਾ ਭਾਂਜ ਪਾਨਨ



ସରୋୟା ହାଁସ ପାଲନ

ঘরোয়া হাঁস পালন

AHEAD Initiatives-এর প্রকাশনা

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড, দক্ষিণ,

কলকাতা - ৭০০০৩১

দূরভাষ: ০৩৩-৪০৬৭০৩৬৯

চিঠিপত্র: ahead@aheadinitiatives.in

ওয়েবসাইট: www.aheadinitiatives.in

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইটি তৈরিতে স্বেচ্ছা সহযোগিতা প্রদান করেছেন ডা: বিকাশ পুততুন্ড।

লেখা ও অধ্যায় বিন্যাস তাঁর সৃষ্টি। অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্ ডা: পুততুন্ডর

কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- কেন হাঁস পালন লাভজনক

সেদিন সবিতাদি গ্রুপের মিটিং-এ এসে বলছিল সে নাকি কোন এক ট্রেনিং থেকে শুনে এসেছে যে হাঁস পালন লাভজনক। এই কথা শুনে মালতিদি বলে উঠল এক সময় আমাদের পাড়াগাঁয়ে অনেকেই হাঁস পালত। এখন আর তা দেখা যায় না। আমি ভাবি তাইরো আমরা এখন আর হাঁস পালি না কেন?

আমি কে? আমাকে সবাই বলুদি বলে ডাকে। আমিও এই অল্পপূর্ণা স্বনির্ভর গোষ্ঠির একজন সদস্যা। আবার ফিরে আসি যে কথা হচ্ছিল সেই কথায়। কেউ বলল বাচ্চারা আর হাঁসের ডিম খেতে পছন্দ করে না। আঁষটে গন্ধ লাগে। কেউ বলল হাঁসের মাংস বিক্রি হয় না। কেউ বলল হাঁসের ডিম খেলে বাত হয়। আবার কেউ বলল এখন পুকুরে কেউ হাঁস চরতে দেয় না। কারণ পুকুরের জল রান্না, স্নান করার কাজে ব্যবহার হয়, তাছাড়া সারা বছর পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ হয়। এমন অনেক কথা। আমার কাছে কিন্তু কোন কথাই ফেলে দেওয়ার মত লাগল না।

আর তাই আমি বললাম, সবই ত বুঝলাম। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে আমরা নানা ভাবে আমাদের সংসারের আয় বাড়াবার চেষ্টা করছি। এক সময়ে আমি যখন ছোট ছিলাম আমার বাপের বাড়িতে হাঁস ছিল। হাঁসের ডিমও খেয়েছি আবার মাংসও খেয়েছি। তখন মুরগীর এত চল ছিল না। দেশী মুরগীর ডিম হয় ছোট। এখন পোল্ট্রীর মুরগীর ডিম বড় হয়। দামটাও আমাদের সাধের মধ্যে। ব্রয়লার মুরগীর মাংসও সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু হাঁস যদি লাভজনক হয় তবে হাঁস পালন নিয়ে মনে হয় কিছু জানা দরকার।

ঠিক হল আমাদের প্রাণীমিত্রা দিদিকে একদিন ডাকা হবে। দিদির নাম বকুল রায়। আমাদের অঞ্চলের বহুমুখী সঙ্ঘের উদ্যোগে তিনি রাজ্য সরকার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আমাদের বাড়ির গরু, ছাগল মুরগীর ভ্যাকসিন তিনিই দেন। তাঁর কাছ থেকেই আমরা শুনে নেব হাঁস পালনের নানা দিক।

বকুলদি এলেন। বললেন একমাত্র গ্রামেই হাঁস পালন করা সুবিধা। কারণ হাঁস খোলামেলা

গ্রামীণ পরিবেশ পছন্দ করে। সারা দিন চরে বেড়ায়। খুঁটে খুঁটে পোকামাকড়, শামুক গুগলি, ঘাস, পাতা, শস্যদানা ইত্যাদি খেয়ে বেড়ায়। পালনের খরচ বাঁচে। ফিরে এলে সামান্য কিছু খাবার দিয়ে ঘরে তুলে নেওয়া যায়। পর দিন সকালে বেলা ৯টার পর ছেড়ে দিলে মনের সুখে আবার চরতে চলে যায়।

এবার বকুলদি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলুন ত বেলা ৯টার পরে কেন ছাড়তে বললাম? আমরা উত্তর দিতে পারলাম না। উনি বললেন বেশিরভাগ হাঁস (প্রায় ৯০%) ভোরবেলা থেকে সকাল ৯টার মধ্যে ডিম পাড়ে। আর তাই প্রতি দিন ডিম সংগ্রহ করাটাও বেশ সহজ হয়। উনি আরও বললেন ছোট বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্য হাঁসের ডিম বেশ উপকারী। আমরা বললাম হাঁসের ডিমের আঁষটে গন্ধ? উনি বললেন একবার খাওয়া অভ্যাস করলেই মানিয়ে নেওয়া যায়। অনেক দেশি মাছের তো নানা রকমের গন্ধ আমরা পছন্দ করে-ই খাই। আমাদের ছোট পরিবারে সপ্তাহে ৩-৪ দিন যদি বাড়ির বাচ্চাদের একটা করে হাঁসের ডিম দেওয়া যায় তা হলে তাদের রোজকার পুষ্টির অভাব অনেকটাই মিটবে।



গ্রামেই হাঁস পালন লাভজনক

অধ্যায় ২

হাঁসের জাত নির্বাচন

এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- কোন জাতের হাঁস বেছে নেব ও নানা জাতের নানা গুণ কি কি?

বকুলদি বলে চলেছেন আমাদের দেশে হাঁসের নানা জাত আছে। তার মধ্যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় আমরা যাকে দেশী হাঁস বলি তাকে আবার পাতি হাঁসও বলি। এই হাঁস আমাদের জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নেয়। চরে খাওয়ার যোগাড় করে নেয়। বছরে গড়ে ১২০-১৫০ টি ডিম পাড়ে। হাঁসার গড় ওজন ১.৮ - ২.০ কেজি আর হাঁসির ওজন ১.৪ - ১.৬ কেজি হয়। এই হাঁসের মাংস সুস্বাদু, আর তাই সাধারনতঃ এই পাতি হাঁসকে ডিম ও মাংস এই দুটোর জন্যই পালন করা হয়।

বেশী ডিম পাড়ে এমন উন্নত জাতের হাঁসও আছে। সেই হাঁসের নাম হল খাকি ক্যাম্পবেল। এই জাতের হাঁস বছরে ২৫০ - ৩০০ টা ডিম পাড়ে। কেবলমাত্র ডিমের জন্য এই হাঁস পালন করা হয়।

ইন্ডিয়ান রানার জাতের আর এক প্রকার হাঁস পাওয়া যায়। এরা খুব চটপটে। দ্রুত দৌড়ে চলে। প্রচুর কীটপতঙ্গ খেয়ে নেয়। বছরে ডিমের পরিমাণ ২০০-২৫০টি। এদের ডিম ও মাংসের জন্য পালন করা হয়। হাঁসার ওজন ১.৬ - ২.৫ কেজি আর হাঁসির ওজন ১.৬ - ২.০ কেজি হয়। এরা সাধারনতঃ বুক টান করে সোজা হয়ে চলে বলে এদের পেঙ্গুইন হাঁসও বলা হয়। এ ছাড়াও আরও অনেক জাতের

হাঁস আছে। যেমন আসামের বরাক উপত্যকায় পাওয়া যায় নাগেশ্বরী হাঁস। কালো রঙের হাঁস, বুকের কাছে সাদা। দক্ষিণ ভারতের চায়রা চামেলী নামের একটি হাঁসও এখন অনেকে পালন করছেন। তবে এই তিন প্রকারের হাঁস আমাদের জল হাওয়ায় বেশ মানিয়ে চলে



পাতি হাঁস



খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস



ইন্ডিয়ান রানার হাঁস

বলে আমাদের রাজ্যে এই তিন ধরনের হাঁসের চলন বেশী। বকুলদি আরও বললেন যে কোন হাঁস পর পর দু'বছর একই রকম ডিম দেয়। এমন কি কোন কোন হাঁস পর পর তিন বছর একই রকম ডিম পাড়ে। আর তাই কোন কোন বাড়িতে পুরনো হাঁস এখনও দেখা যায়। কিন্তু মুরগী প্রথম বছরে যে পরিমাণ ডিম পাড়ে পরের বছরগুলিতে সেই পরিমাণে ডিম দেয় না। আর তাই খুব পুরনো মুরগী খুব একটা দেখা যায় না।



থাকি ক্যাম্পবেল হাঁস কেবলমাত্র ডিম পাড়ার জন্য পালন করা হয়, বছরে ২৫০-৩০০ টা ডিম পাড়ে

অধ্যায়



কতগুলো হাঁস দিয়ে শুরু করবেন

এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- কতগুলো হাঁস নিয়ে আমরা শুরু করব?

বকুলদির কথায় হাঁস পালন করতে হলে জল লাগবে। সাধারনতঃ গ্রামে বাড়ি তৈরি করতে হলে মাটি লাগে। সেই মাটি নিজেদের জমি কেটেই পাওয়া যায়। এই কাটা গর্তেই জল জমে। এক সময় তা-ই খিড়কীর পুকুর হয়ে যায়। তা ছাড়া অনেক বাড়িতেই নিজেদের ছোট পুকুর বা জলাশয় আছে। কারও বা বড় পুকুরের অংশ আছে। আর আছে পুকুর পাড়ের ঝোপ বাড়ি, যেখানে নানা রকমের কীট, পতঙ্গ নিয়ে একটা বাস্তুতন্ত্র তৈরি হয়। হাঁসের জন্য উপযোগী এই বাস্তুতন্ত্র। শুরু করতে হলে ৫-১০ টা হাঁস নিয়ে শুরু করা যায়। আস্তে আস্তে ৪০-৫০টা হাঁস পালন করতে পারলে হাঁস পালন করে সংসারের অভাব খানিকটা মেটান যায়।



গ্রামের খিড়কি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র
দেশী হাঁসের নিজস্ব পরিবেশ

অধ্যায় ৪

হাঁসের ঘর তৈরি

এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- হাঁসের ঘর কেমন হবে?

বকুলদি বললেন, এবার আসি ঘরের কথায়। যে কোন প্রাণী পালন করতে হলে তার বাসস্থান উপযোগী হতে হবে। অনেকে এই একটা জায়গায় কার্পণ্য করেন। যেমন তেমন একটা থাকার ব্যবস্থা করে প্রাণী কিনে ফেলেন। এটা ঠিক নয়। কারণ একবার খামার চালু হয়ে গেলে তখন আর বাসস্থান পালটানো যায় না।

হাঁসের ঘর তৈরীর সময় মনে রাখতে হবে তার নিরাপত্তার কথা ও তার পছন্দ অপছন্দের কথা। শেয়াল, বেজি থেকে শুরু করে তাদের অনেক শত্রু। আবার হাঁস একটু ভীতু প্রকৃতির। রাতে চাঁদের আলোর ছায়া পড়লেও সে ভয় পেয়ে যায়। আমাদের হাঁস যেহেতু সারা দিন চরে বেড়িয়ে রাতে ঘুমোতে আসবে, আমরা সেইমত তাদের ঘর বানাব। ঘর তৈরির আগে কোথায় ঘর তৈরি হবে তার জায়গাটা বেছে নিতে হবে। যেমন,

- ঘরে যাতে প্রচুর পরিমানে বায়ু চলাচল করতে পারে। এই রকম ঘরে রোগ জীবাণু ছড়ায় কম।

- ঘরের কাছে কোন বড় গাছ বা ঝোপ ঝাড় না থাকে।

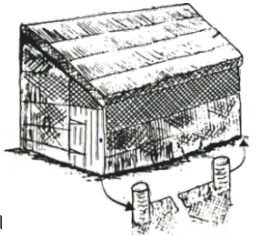
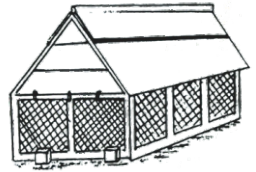
- এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানে জল যেন না জমে। ঘরের মেঝে যেন ভিজে স্যাঁতস্যাতে না হয়ে যায়।

- দিনের বেলা যেন ঘরের ভিতরে আলো হাওয়া চলাচল করতে পারে। এই রকমের ঘরে রোগ জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না।

- ঘরের মেঝে মাটির, সিমেন্টের অথবা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে।

- **তক্তা দেওয়া মেঝে:** ডিম পাড়া হাঁসের জন্য সব চেয়ে ভাল মেঝে। এর সুবিধা হল, মেঝে মাটি থেকে উঁচুতে থাকে, ফলে বাতাস চলাচল ভাল করে এবং ইঁদুর, সাপ থেকে ভয় থাকে না।

- **সিমেন্টের মেঝে:** এই প্রকার মেঝে উপযুক্ত বড় ও স্থায়ী বাড়ির জন্য। ইঁদুর থেকে ভয় থাকে না। সহজেই পরিষ্কার করা যায়। সিমেন্টের মেঝে খুব ঠান্ডা। তাই সামান্য তুষ বা কাঠের গুঁড়ো বা খড় কুটো ফেলে রাখলে ঠান্ডার হাত থেকে হাঁস রক্ষা পায়।



■ **মাটির মেঝে:** বেশীরভাগ মেঝে মাটির তৈরী হয়। ইঁদুরের উৎপাত বেশী হয়। মাটির মেঝেতে ছাই দিলে ভাল হয়। সঙ্গে কিছুটা বালি ছড়িয়ে দিতে হবে। এইভাবে ইঁদুরের উৎপাত কিছুটা কমানো যায়।



■ **গ্রাম্য পদ্ধতিতে তৈরি বাড়ি:** অন্যান্য যে কোন পদ্ধতি থেকে সস্তা এবং সহজে তৈরি করা যায়। বাঁশ, খড়, টিন, তারের জাল, পেরেক প্রভৃতি দিয়ে তৈরি করতে হবে। এই রকমের ঘরে ৩০ – ৪০ টি হাঁস সহজেই রাখা যায়।



■ হাঁসের ঘরে আলোর দরকার হয় না। বেশী জানালা থাকলেও হাঁসের অসুবিধা হয়।

■ হাঁসের পায়খানাতে বেশী জলীয় ভাগ থাকে। এই কথা মনে রেখে হাঁসের ঘর সর্বদা শুকনো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। না হলে অসুখ বিসুখের প্রকোপ বাড়বে।

■ হাঁসের ঘরের দরজা চওড়া হতে হবে, না হলে ওদের বের হওয়ার সময় গুঁতোগুঁতি শুরু হবে। কারণ হাঁস সবাই মিলে এক সাথে ছড়োছড়ি করে বের হতে চায়।

■ কত বড় ঘর তৈরি হবে তা নির্ভর করে কতগুলো হাঁস পালা হবে তার ওপর। প্রতিটি হাঁসের বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল / আকার কেমন হবে তার একটা ধারণা দেওয়া হল:-

বয়স (সপ্তাহে)	কাঁচা/ পাকা/ কাঠের মেঝে
০ – ১	১/২ বর্গফুট / হাঁস
১ – ২	৩/৪ বর্গফুট / হাঁস
২ – ৩	১ বর্গফুট / হাঁস
৩ – ৪	২ – ২ ১/২ বর্গফুট / হাঁস
পূর্ণ বয়স্ক	৪ – ৫ বর্গফুট / হাঁস

■ ঘরের আকার হওয়া উচিত লম্বা ও আয়তাকার। এই রকমের ঘরে আলো বাতাস সহজে খেলা করে।

■ ঘরের ছাদের উচ্চতা ৯ – ১০ ফুট হলে ভাল।

■ ঘরের বাইরের গ্রাউণ্ড লেভেল থেকে ২ফুট উঁচু দেওয়াল তুলে দাওয়া করে নিতে হবে

■ হাঁসের ঘরের কাছাকাছি অন্য কোন প্রাণীর ঘর না থাকাই ভাল।



**হাঁসের ঘর হবে পরিষ্কার ও শুকনো,
আসে পাশে ঝোপ-ঝাড় থাকবে না**

অধ্যায়



খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা

এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- হাঁসের খাবার ও জলের ব্যবস্থা কি ভাবে করব?

বকুলদি এবার হাঁসের খাবারের কথা বলতে শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি বললেন হাঁস চরে বেড়িয়ে তার প্রয়োজনের ৭০% খাবার খেয়ে নেয়। কিন্তু তাদের স্বভাবটা হল কেবলই খাই খাই।

হাঁস জলের আণুবীক্ষণিক প্রাণীকণা (জু প্লাস্কটন) খেয়ে থাকে। আবার হাঁসের পায়খানা পুকুরের জলে মিশে উদ্ভিদকণা ও প্রাণীকণা তৈরি হতে সাহায্য করে। হাঁস তাই যে কোন জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ। এই খাদ্য ছাড়া আরও কিছু পরিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আবার হাঁসের বিভিন্ন অবস্থায়, যেমন বাড়ন্ত অবস্থায় ও ডিম পাড়া অবস্থায় তাদের শরীরের পুষ্টির চাহিদাও বিভিন্ন থাকে। এত সব বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হাঁস পালনের সম্প্রসারণ পুস্তিকা থেকে বকুলদি নিচের ফর্মূলা আমাদের হাত তুলে দিলেন:-

হাঁস পালন

- খাকি ক্যামেল হাঁসের খাদ্যের তালিকা:

খাদ্যের উপাদান (কেজি/১০০ কেজিতে) (০-৩ সপ্তাহ)	স্টার্টার হাঁস (৪-২০ সপ্তাহ)	থ্রোয়ার হাঁস (২০ সপ্তাহের বেশি)	লেয়ার হাঁস
হলুদ ভুটা ভাঙ্গা	৩৪.৫০	৪৭.০০	৪১.০০
গম ভাঙ্গা	২৭.০০	২৪.০০	২৬.০০
সয়াবিন মিল (খোসা ছাড়ানো তাপ দিয়ে পরিশোধিত)	২৬.০০	১৬.০০	১৯.০০
সুটকি মাছের গুঁড়ো	৮.০০	৮.০০	৬.০০
লোশন পাতা গুঁড়ো	২.০০	২.৫০	২.৫০
শামুক ও ঝিনুকের ভাঙ্গা খোল	-	-	-
খনিজ পদার্থের মিশ্রণ	২.৫০	২.৫০	২.৫০
ভিটামিন	*	*	*

* প্রতি ১০০ কেজি খাদ্যে ৩৫ গ্রাম রোজিমিন বা ভিটামিন বা ৫ গ্রাম নিয়াসিন এবং ৩৫ গ্রাম কোলিন ক্লোরাইড মেশাতে হবে।

বকুলদি আরও বললেন হাঁসের খাদ্যনালীতে প্রাকৃতিক ভাবে কিছু নিঃসরণ গ্রন্থি কম থাকায় শুকনো খাবার খেতে হাঁসের অসুবিধা হয়। আর তাই হাঁসের খাবার একটু জলে ভিজিয়ে নরম করে দিলে ভাল হয়। তা না হলে হাঁস মুখে করে কিছুটা খাবার নিয়ে জলের পাত্রের কাছে গিয়ে জলে মুখ ডুবিয়ে ঘাড় উঁচু করে গিলে নেয়। সাধারণতঃ সকালে একবার এবং বিকালে ঘরে ফিরে আসার সময় আর একবার খাবার দিলে ভাল। খাবারের পাত্র, জলের পাত্র সব সময় পরিস্কার করে রাখতে বললেন। সারা দিনে হাঁস গড়ে $1\frac{1}{2}$ – ২ লিটার জল পান করতে পারে। জলের পাত্র এমন হবে যেন মুখটা ডোবাতে পারে।



হাঁস চরে বেড়িয়ে তার প্রয়োজনের ৭০% খাবার খেয়ে নেয়।

অধ্যায় ৬

বাচ্চা হাঁসের যত্ন, বাড়ন্ত হাঁসের যত্ন ও পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের যত্ন

এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- বাচ্চা হাঁসের, বাড়ন্ত হাঁসের ও পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের যত্ন
কি ভাবে করব?

বকুলদি বললেন প্রথমে যাঁরা শুরু করবেন তাঁরা সাধারণতঃ ৩-৪ মাসের বড় হাঁস কিনে শুরু করতে পারেন। হাঁসের বাচ্চা দ্রুত আকারে বাড়ে। তাই ১০০ হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিং করতে ২০০-২৫০ বর্গফুট মেঝে আছে এমন ঘর বেছে নিতে হবে। এই ঘরকে ব্রুডার হাউস বা আঁতুর ঘর বলা হয়। ঘরটি আলো বাতাস খেলে এমন ঘর হবে। ঘরের চার পাশের নেট ভালভাবে চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে উপর দিয়ে দূষিত হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা যেন থাকে।

বাচ্চা আসার আগে ব্রুডার হাউসকে ভালভাবে জীবাণু মুক্ত করতে হবে। প্রথম সপ্তাহে প্রতি বাচ্চা পিছু ১/২ বর্গ ফুট ধরে ৫০ বর্গ ফুট জায়গা ১ ফুট উঁচু চীক গার্ড দিয়ে গোল করে ঘিরে তার মধ্যে শুকনো লিটার (কাঠের গুঁড়ো) বিছিয়ে বস্তা দিয়ে ঢেকে তার উপরে পুরানো খবরের কাগজ বিছিয়ে বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে। এই বৃত্তাকার জায়গার মাঝে একটি ৬০ ওয়াটের ফিলামেন্ট বাল্ব উপরে হুড দিয়ে দু'হাত উপরে ঝুলিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাচ্চাগুলো এক জায়গায় জড়ো না হয়ে যায়। প্রথম ৭ দিন শীত কালে রাতে কোন এক জনকে পাহারা দিতে হবে। দেখতে হবে বাচ্চাগুলো যেন ঠাণ্ডায় জড় না হয়ে যায়।

বাচ্চা আসার পরে জলের পাত্রে প্রতি লিটার জলে চার চা চামচ ইলেক্ট্রোলাইট পাউডার গুলে খাওয়াতে হবে। এইভাবে প্রাথমিক ধকল কেটে যাবে। প্রথম ৮ সপ্তাহ ডাক স্টার্টার ম্যাশ দিতে হবে। হাঁসের বাচ্চা দ্রুত বাড়ে। যেমন যেমন বাড়বে তেমন তেমন ঘেরা জায়গাটাও বেড়ে যাবে। ৩ সপ্তাহ পরে সমস্ত ঘরে ছেড়ে দিতে হবে। তত দিনে তাদের গায়ে পালক গজিয়ে যাবে। এবং ধীরে ধীরে তাপের প্রয়োজনও ফুরোবে। ৪ সপ্তাহ শেষ হলে তাদের জলে নামানো যাবে এবং ব্রুডিং এর কাজও শেষে হবে। এই সময়ে প্রতিটি বাচ্চা ১.৫ কেজি ডাক স্টার্টার ম্যাশ খাবে।



এই সময়ে প্রায়শঃই যে সমস্ত সাধারণ ভুল হয়:

- সারা গায়ে জল মাখা বন্ধ না করা
- পরিশ্রম বাঁচানোর তগিদে সারা রাত ডাক স্টার্টার ভিজিয়ে রাখা
- ডাক স্টার্টার না ব্যবহার করে চীক স্টার্টার বা ব্রয়লার স্টার্টার ম্যাস ব্যবহার করা

বাড়ন্ত বাচ্চার যত্ন:

৫-১৬ সপ্তাহ বয়স হল হাঁসের বাচ্চার বেড়ে ওঠার সময়। এই সময় তাদের ডাক থোয়ার ম্যাস খাওয়াতে হবে। ওদের বাইরে পুকুরে, পুকুরের পাড়ে ছেড়ে দিতে হবে। ওরা পোকামাকড়, ঘাস, পাতা খাওয়া ধরবে। জলের থেকে জুপ্ল্যাক্টন খেতে থাকবে। এই সময় তাদের ঘরের আয়তনও বেড়ে যাবে। প্রতিটি হাঁসের জন্য $2\frac{1}{2}$ -৩ বর্গফুট জায়গা লাগবে। জলের পাত্রের গভীরতা ৫"-৬" রাখতে হবে। তারা যাতে মুখের কিছুটা ডোবাতে পারে। এইভাবে রাখলে হাঁসের চোখের পক্ষে ভাল হবে। হাঁসের চোখে চোখের জলের গ্রন্থি না থাকায় বাইরে থেকে জলের প্রয়োজন হয়। বকুলদি আরও বললেন, এই বাড়ন্ত সময়ে তাদের ডাক থোয়ার ম্যাস দিতে হবে। এই সময়ে প্রতিটি বাচ্চা আনুমানিক ১০ কেজি থোয়ার ম্যাস খাবে।



পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের যত্ন:

খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস ১৭ - ১৮ সপ্তাহ বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে দেয়। প্রতিটি হাঁসের জন্য ঘরের ভিতর ৪-৫ বর্গ ফুট জায়গা লাগবে। প্রতি ১০টা হাঁসের জন্য ১টি করে ডিম পাড়ার বাক্স (লেয়ার বাক্স) দিতে পারলে ভাল। বাক্সের মধ্যে কিছু খড়কুটো রেখে দিতে হবে। হাঁস এখানে ডিম পাড়বে। বাইরে ডিম পাড়লে ডিম বেশী নোংরা হয়। আবার কোন ডিম কোন কারণে ভেঙে গেলে যদি কোন হাঁস ঐ ডিম খেয়ে নেয় আর, তার মধ্যে টাটকা পাড়া ডিম খাওয়ার নেশা ধরে যায়। এই নেশা বা বদ অভ্যাস অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে বেশী সময় লাগে না। তখন ডিমের উৎপাদন হলেও তা সঞ্চয় করা যায় না বা তা থেকে কোন আয় হয় না। হাঁস পালনের উদ্দেশ্য মাঠে মারা যায়। ঐ হাঁসের স্বভাব পাল্টানো যায় না। খামার টি উঠে যেতে বসে। এই বিষয়ে সাবধান থাকতে বকুলদি বললেন। ১৭ - ২৪ সপ্তাহে প্রতিটি বাচ্চা ১৬.৫ কেজি ডাক লেয়ার ম্যাস খাবে। এর পর ডিমের উৎপাদনের উপর নির্ভর করে হাঁস পিছু ১২০ - ১৭০ গ্রাম ডাক লেয়ার ম্যাস দিতে বললেন।



হাঁসের খাবার ও মুরগীর খাবার আলাদা।
হাঁসকে হাঁসের জন্য তৈরি খাবার দিতে হবে।

অধ্যায় ৭ রোগ ও টিকা

এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- হাঁসের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা

বকুলদির কাছে জানতে পারলাম হাঁসের অনেক রকমের রোগ আছে। কিন্তু দু'টি রোগ ওদের পক্ষে বেশী ক্ষতিকারক। রোগ দুটি হল ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা।

ডাক প্লেগ ভাইরাস ঘটিত রোগ। এই রোগের সংক্রমণে হাঁসের চোখ ও নাক দিয়ে জল পড়ে, খাওয়া বন্ধ করে দেয়, ঝিমুতে থাকে, পালক উক্ষো-খুক্ষো হয়ে যায়, ডানা ঝুলে যায়, সবুজ রঙের সাদা ফেনাযুক্ত পায়খানা হয়। পা গুটিয়ে বকের কাছে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। দ্রুত মারা যায়। কখনো কখনো কোন লক্ষণ না দেখিয়ে হাঁস মারা যায়। পুকুরে হাঁস চরতে চরতে মরে ভাসতে দেখা যায়। এই রোগ একবার দেখা দিলে ১০০% হাঁসের মৃত্যু হতে পারে। এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। প্রতিকার আছে। ডাক প্লেগের টিকা ২ সপ্তাহ বয়সে প্রথম বার, ১০ সপ্তাহ বয়সে দ্বিতীয়বার ও ২৪ সপ্তাহ বয়সে তৃতীয় বার - এই ভাবে মূল টিকার পর দু'বার বুস্টার ডোজ দেওয়ার পর বছরে একবার ডাক প্লেগের টিকা বা ভ্যাকসীন করিয়ে নিতে হবে।



ডাক কলেরা ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত রোগ। যে কোন বয়সের হাঁসের ক্ষেত্রে এই রোগ হতে পারে। তবে ৪ মাস বয়সের হাঁসে এই রোগ বেশী দেখা যায়। ৫০% হাঁস মারা যায়। প্রথম অবস্থায় হাঁস ঝিমুতে থাকে। জ্বর, শ্বাসকষ্ট, খিদে কমে যাওয়া, বারে বারে পিপাসা পাওয়া ও জল খাওয়া, সবুজ রঙের পায়খানা, চলাফেরা করতে পারে না, পায়ের গাঁট ফুলে যায়, পা অসাড় হয়ে যায়, হঠাৎ মারা যায়। এই রোগের টিকা প্রথম ৩ মাস বয়সে, দ্বিতীয় বার প্রথম টিকা দেওয়ার ১-২ মাস পরে বুস্টার ডোজ, এর পর প্রতি বছরে ১ বার।

বকুলদি বললেন রোগের চিকিৎসার থেকে রোগ যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করা ভাল। এই জন্য তিনি কয়েকটি বিষয়ের দিকে তিনি আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে বললেন:-

- রোগমুক্ত সবল বাচ্চা কিনতে হবে।
- খামারে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- পরিস্কার পানীয় জল ও ভাল এবং পরিমাণমত খাবার দিতে হবে।
- আলো-বাতাসযুক্ত জায়গায় হাঁসকে রাখতে হবে।
- ঘরের মেঝে শুকনো রাখতে হবে।
- হাঁসের ঘর ও জলের পাত্র, খাবারের পাত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- মাঝে মাঝে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জল দিয়ে খামার ও বাসন কোসন ধুয়ে নিতে হবে।
- ছত্রাক লেগে যাওয়া কোন খাবার হাঁসকে দেওয়া যাবে না।

বকুলদি আরও বললেন যদি কোন হাঁস মারা যায় তবে তাকে ফেলে না দিয়ে মৃত হাঁসটিকে সরকারী প্রাণী চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজন হলে তিনি মৃত হাঁসটির পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষা করতে পারেন অথবা সমস্ত শুনে প্রতিকারের ব্যবস্থা বলে দেবেন।



**ডাক প্লগ ও ডাক কল্দেরা টিকা
অবশ্যই করাতে হবে**

অধ্যায়



ডিম সংগ্রহ ও বিক্রি

এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- ডিম সংগ্রহ ও ডিমের বিপণন কৌশল

বকুলদি এবারে যা বললেন তা শুনে আমাদের অনেক ভুল ধারণা দূর হল। যেহেতু আমাদের খামারে পুরুষ ও স্ত্রী হাঁস একসাথে থাকবে, তাই ডিমের বেশীরভাগই নিষিক্ত করা হবে। অর্থাৎ তারা বাওয়া ডিম নয়। সেই জন্য এই ডিম সংগ্রহ করার সময় প্রতিদিনের ডিম যাতে চেনা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এবং ৫-৭ দিনের বেশী এই ডিম রাখা যাবে না। নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই কথাটা মনে রেখে ডিম বিক্রি করতে বললেন। যাঁরা বাচ্চা ফোটানোর জন্য নেবেন তাঁদের টাটকা ডিম একটু বেশী দামে বিক্রি করার পরামর্শ দিলেন। আবার গ্রামে চরে বেড়ান হাঁসের ডিমের চাহিদা যেখানে বেশী সেই বাজার ধরতে পারলে ডিম বিক্রি করে বেশী আয় করা যায় তাও বললেন।



ডিমের চাহিদা যেখানে আছে সেই জায়গায় আমাদের পৌঁছে যেতে হবে।

অধ্যায় ৯

আনুমানিক আয়-ব্যয় ও লাভের হিসাব

এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- ঘরোয়াভাবে ৩০টি হাঁস নিয়ে শুরু করলে আয় ব্যয় কত হবে?

(৩০টি হাঁস দিয়ে শুরু করলে)

শুরুতে কেন ৩০টি হাঁস?

৫-১০ টা খুব ছোট, ৪০-৫০ টা নতুনদের পক্ষে ভারী।

৩০টি হাঁস = নিরাপদ, লাভজনক ও সহজে সামলানো যায়।

ধরা হলো — ২৭টি হাঁস + ৩টি হাঁস

প্রাথমিক খরচ (একবারের খরচ)

খাত	পরিমাণ	টাকা
হাঁস কেনা	৩০ x ₹২৫০	₹ ৭,৫০০
ঘর তৈরি	বাঁশ-খড়-টিন	₹ ৪,০০০
খাবার পাত্র, জলের পাত্র		₹ ৮০০
প্রাথমিক ওষুধ ও টিকা		₹ ৭০০
মোট প্রাথমিক খরচ		
ডিম পাড়ার পাত্র	২ x ₹১০০	₹ ২০০
চটের বস্তা	৮টি x ₹৬০/-	₹ ৪৮০
কাঠের গুঁড়ো	২ বস্তা	₹ ১০০
চুন (কলিচুন)	৫ কেজি x ₹১০/-	₹ ৫০
		₹ ১৩,৮৩০

মাসিক চলতি খরচ

খাত	টাকা / মাস
খাবার (পরিপূরক খাদ্য)	₹ ১,২০০
ওষুধ-ভিটামিন	₹ ২০০
ছোটখাটো খরচ	₹ ১০০
মোট	₹ ১,৫০০

বাৎসরিক চলতি খরচ = ₹ ১,৫০০ × ১২ = ₹ ১৮,০০০

বাৎসরিক আয় (ডিম থেকে)

একটি হাঁস গড়ে বছরে	= ১৬০ টি ডিম
২৭টি হাঁস: ২৭ × ১৬০	= ৪,৩২০ টি ডিম
প্রতি ডিম বিক্রি	= ₹ ১০
ডিমের আয়: ৪,৩২০ × ₹ ১০	= ₹ ৪৩,২০০
পুরনো হাঁস বিক্রি (বছর শেষে)	
৩০টি হাঁস × ₹ ৩৫০	= ₹ ১০,৫০০
লিটার বিক্রী (হাঁসের পায়খানা) ২ বস্তা	= ₹ ১০০

মোট হিসাব (১ বছর)

বিষয়	টাকা
মোট আয়	₹ ৪৩,২০০ + ₹ ১০,৫০০ = ₹ ৫৩,৭০০
মোট খরচ	প্রাথমিক ₹ ১৩,৮৩০ + চলতি ₹ ১৮,০০০ = ₹ ৩১,৮৩০
নেট লাভ	= ₹ ২১,৮৭০

প্রায় ২৩ হাজার টাকা লাভ — শুধু ৩০টি হাঁস থেকে

বাস্তব কথা

এটা কাগজের হিসাব নয়।

এই পরিমাণ আয়-লাভ গ্রামে বহু পরিবার বাস্তবে করছে।

অধ্যায় ১০

সাধারণ ভুল ও তার প্রতিকার

এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- আমাদের কি কি ভুল হতে পারে ও তার প্রতিকার

সাধারণ ভুল	ভুলের ফল	প্রতিকার
কম জায়গায় বেশী হাঁসের ভিড়	রোগ বাড়ে	ঘরের মেঝের সঠিক পরিমাপ
নোংরা জল	রোগ	প্রতিদিন জলের পাত্র ধোয়া
টিকা না দেয়া	হঠাৎ মৃত্যু	সময় মত নিয়ম করে টিকা দেওয়া
ভিজে মেঝে	পায়ে ঘা	শুকনো রাখা
ভুল খাবার	বৃদ্ধি কম	সঠিক খাবার (ফীড)



এই অধ্যায় থেকে আমরা কী শিখব?

- আমাদেরই মত এক জন গ্রামের মহিলা যদি পারে তবে আমরাও পারব।

বকুলদির জানা শোনা এক জনের নাম ভাদ্রী সিং। আদিবাসী বৌ। নদীয়ার হরিনঘাটা ব্লকের কানাপুকুর ডাঙ্গায় বিয়ে হয়ে এসেছে। বাপের বাড়ি হাবরায়। বাপের বাড়ি থেকে আসার সময় দিদি দিয়েছিল ২টি মুরগীর বাচ্চা। শ্বশুর বাড়িতে এসে তাদের বড় করে। একটা মরে যায়। যেটা বেঁচে থাকে সেটা ডিম পাড়তে শুরু করে। এর পর সে তা'য়ে বসতে চায়। গ্রাম থেকে কয়েকটা হাঁসের ডিম কিনে ঐ মুরগীতে তা'য়ে বসিয়ে প্রথম কিছু হাঁসের বাচ্চা তোলে। সেই বাচ্চাদের বড় করে।

ভাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করলে বলে 'আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার বাবা হাঁস পুষত। শ্বশুরবাড়িতে এসে দেখলাম এদের একটা ছোট পুকুর আছে। কি মনে হল, হাঁস পালনেই মন দিলাম। ধীরে ধীরে আমাদের বাড়িতে ছোট হাঁসের খামার হয়ে গেল। ৮-১০টা হাঁস আমাদের থাকতই। স্বামী কাঠের মিস্ত্রি। তাকে বলে একটা হাঁসের ঘর বানিয়ে নিলাম। আমাদের বাড়ি লাগোয়া বিঘে দু'য়েক জমি আছে। হাঁস আমাদের জমি, বাড়ির আনাচে কানাচে, আর পুকুর ছাড়া কোথাও যায় না। দিনের ভিতর বার চারেক তারা আমার কাছে আসবেই। এসেই ডাকতে থাকবে। ওদের তখন কিছু খেতে দিতেই হবে।

আমাদের একটা গাই গরু ও ২টো ছাগল আছে। ওদের গোবর, নাদি খড়-কুটো সব এক জায়গায় জড় করে রাখা হয়। সার হয়। জমিতে দেওয়া হয়। গোবর থাকলে সেখানে মাটিতে কেঁচো হবেই। একদিন হাতে কোদাল নিয়ে জায়গাটা পরিস্কার করছিলাম। ওমনি কেঁচো বেরিয়ে পড়ল। সেই দেখে ওরা ছুটা এসে কেঁচো খেয়ে নিল। তার পর থেকে দিনে একবার ওরা ওখানে এসে ডাকা-ডাকি শুরু করে দেয়। আমার যত কাজই থাকুক হাতে কোদাল নিয়ে এক কোপ মাটি কুপিয়ে ওদের কেঁচো খাওয়াতেই হবে।

হাঁসের ডিমের চাহিদা আছে। প্রথম প্রথম জোড়া ১০ টাকাতে বিক্রি করেছি। এখন একটা ডিম ১০ টাকায় বিক্রি করি। অনেক দিন ধরে হাঁস পালছি। তাই পাইকার আমার বাড়িতেই এসে ডিম নিয়ে যায়। আমি নিজে একটা স্মার্ট ফোন কিনেছি। ডিম জমে গেলে ফোনেই

খবর দিতে পারি পাইকারকে। আমার সব দেশী হাঁস। এখন আছে ৫০ টা। এখন আমি হাঁসে তা বসিয়ে হাঁসের বাচ্চা তুলি। হাঁসের মা তার বাচ্চার যত্ন নিতে তেমন পারে না। একেবারে প্রথম দিন থেকেই আমি ওদের যত্ন নিই। প্রথমেই ওদের জলে ছাড়ি না। খাবার দাবার দিয়ে একটু বড় হলে তবে ওদের জলের কাছে নিয়ে যাই। কিছুক্ষণ রেখে তুলে নিই। এইভাবে এক মাস হয়ে গেলে আর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয় না। ৪-৫ মাস হলেই ওদের বিক্রি করে দিই। হাঁস পিছু ৪০০-৫০০ টাকা পাই। আমায় কোথাও যেতে হয় না। ফোনে ফোনে খবর দিয়ে দিই। পাইকার এসে নিয়ে যায়।

আমি হাঁস পালন করে নিজের সংসারকে দাঁড় করিয়েছি। এখন আমার মেয়ে স্কুলে যায়, মাস শেষে ব্যাল্কে টাকা জমে'।



উপসংহার

হাঁস পালন কোন বড় খামার বা বড় পুঁজির বিষয় নয়। এটা গ্রামের সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে মহিলাদের কাজ, যার মাধ্যমে অল্প পুঁজি দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের সংসারকে শক্ত করে তোলা যায়। এই বইয়ের পাতায় পাতায় আমরা দেখেছি — কিভাবে কয়েকটি হাঁস দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে এগোন যায়। কিভাবে গ্রামের পুকুর, ঝোপঝাড়, ফাঁকা জায়গা — সবকিছুই হাঁস পালনের কাজে লাগিয়ে আয় বাড়ানো যায়। কিভাবে নিয়মিত যত্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক টিকার মাধ্যমে হাঁস পালন নিরাপদ ও লাভজনক হয়ে ওঠে। হাঁস পালন শুধু অর্থনৈতিক লাভ নয়, এটা পরিবারের পুষ্টি নিশ্চিত করে, মেয়েদের স্বাবলম্বী করে, গ্রামের অর্থনীতিকে মজবুত করে। যে পরিবার আজ ১০টি হাঁস দিয়ে শুরু করবে, সেই পরিবার আগামী দিনে ৫০টি হাঁসের মালিক হবে — এই বিশ্বাস নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। এই বই যদি কোন এক জন মানুষকেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে, তবে এই লেখার সার্থকতা সেখানেই।

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



32/6, Gariahat Road (S), Kolkata 700 031
Phone: +91 033 40670369

